## অষ্টম অধ্যায়

# আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে মনসা কথার নবনির্মাণ

বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে আধুনিকতম সাহিত্য-সংরূপ হল ছোটগল্প। আর এই ছোটগল্পের সার্থক সূত্রপাত হয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ বাংলা সাহিত্য জগতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ছোটগল্পেরও উৎসকাল। এরপর বাংলা ছোটগল্পের ধারায় পাই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পরশুরাম বা রাজশেখর বসু, প্রমথ চৌধুরী ইত্যাদি ছোটগল্পকারদের। এই সময় বাংলা ছোটগল্পের দিক পরিবর্তন ঘটে প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কল্লোল গোষ্ঠীর হাতে। তবে জগৎ, জীবন, ব্যক্তি ও সমাজ বিষয়ে তীব্র তীক্ষ্ণদৃষ্টি, সব কিছু যাচাই করে নেওয়ার প্রবণতা, জীবন সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিক তির্যক দৃষ্টিকোণ, অন্তর্নিহিত জটিলতার উন্মোচন, সব মিলিয়ে নতুন জিজ্ঞাসা, নতুন মূল্যবোধ নির্মাণের আধুনিকতা— এতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন কল্লোল গোষ্ঠীর বাইরে তথা কল্লোল পরবর্তী লেখকগোষ্ঠী। তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করা যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত ও সুবোধ ঘোষের। এছাড়া নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী প্রভৃতি ব্যক্তিত্বের নাম করা যায়, যাঁরা ছোটগল্পের বড় শিল্পী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। উত্তাল রাজনৈতিক পটভূমিকায় মানুষের জীবনধারার আমূল পরিবর্তন তা ষাট, সত্তর ও আশির দশকের গল্পগুলিতে পাই আমরা। এক্ষেত্রে প্রথমেই নাম করতে হয় ব্যতিক্রমী কথাসাহিত্যিক বিমল কর ও মহাশ্বেতা দেবীর। এছাড়া সাধন চট্টোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, অভিজিৎ সেন, কিন্নর রায়, আবুল বাশার, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, নলিনী বেরা, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, সৈকত রক্ষিত, অনিল ঘড়াই, রামকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিত্বের হাতে সমাজগত বিপর্যয় ও ব্যক্তির পরিচয় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ও মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণগুলি উঠে এসেছে। এইভাবে বাংলা সাহিত্যের নতুন নতুন দিক্‌বদল ঘটে। যান্ত্রিক সভ্যতার আমূল অগ্রগতি, বিশ্বায়ন ও উত্তর-আধুনিকতার ফলে বিশ শতকের শেষার্ধ ও একুশ শতকের প্রথমার্ধের ছোটগল্পেও নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ ঘটেছে। এরকমই একটি নতুন দিক হল পুরাতনের দিকে হাতা বাড়ানো। বর্তমান সময়ের মানুষের মনের অন্তগূঢ় রহস্য, সম্পর্কের টানাপোড়েন, মানুষের সংশয়-হতাশা ইত্যাদি তুলে ধরতে গিয়ে অনেকসময় জাতীয় ঐতিহ্যকে নিয়েছেন নিজের লেখনীতে। আমাদের

মধ্যযুগের মনসাকথাকে নিয়ে লেখা আধুনিক কালে কয়েকটি ছোটগল্পের পরিচয় আমরা পাই। সেগুলি হল—

১. মহাশ্বেতা দেবীর 'বেহুলা' (১৯৭৮খ্রী:)

২. বিমল করের 'বেহুলা' (১৯৮৫ খ্রী:)

৩. সাধন চট্টাপাধ্যায়ের 'সতত বেহুলা' (২০০৫ খ্রী:)

বর্তমান অধ্যায়ে গল্পগুলির বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারিণী হলেন লেখিকা **মহাশ্বেতা দেবী** (১৯২৬-২০১৬)। তাঁর লেখা '**বেহুলার-বারমাস্যা**' গ্রন্থটির অন্তর্গত '**বেহুলা**' (১৯৭৮খ্রী:) নামক গল্পটিতে 'মনসামঙ্গলের বেহুলার কথা ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণে পাই আমরা। গল্পের এই দৃষ্টিভঙ্গিটি তুলে ধরার আগে কবি সম্পর্কে আমাদের কিছু বলে নেওয়া উচিত। ১৯৬৫ সালে তাঁর প্রথম রচনা 'ঝাসির রাণী'র প্রকাশ। এরপর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত চলে এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমা। শুধু বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষকে যে কত কী করতে হয়, মহাশ্বেতা দেবীর গল্প-উপন্যাসে তার আশ্চর্য হদিস পাওয়া যায়। তিনি দিনের পর দিন গ্রাম বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন, মাটির কাছাকাছি মানুষের অন্তরে প্রবেশ করেছেন। অন্তেবাসী সমাজ বা সম্প্রদায়ের জীবনতথ্য ও ইতিহাসের সন্ধানে এই মানুষের ঘরে প্রবেশ করেছেন— এবং এই অভিজ্ঞতাগুলিই তাঁর রচনায় উঠে এসেছে। তাঁর অন্যতম গল্পগুলি– বান, বায়েন, পাখমারা', 'শিকার', 'বিছন', 'মৌল অধিকার' ও 'ভিখারী দুসাদ', 'বেহুলা', 'দ্রোপদী' প্রভৃতিতে 'সমাজের বাগদি', 'ডোম', 'ওঁরাও', 'গঞ্জু', মাল বা ওঝা, সাঁওতাল শ্রেণীর জীবন সংগ্রাম উঠে এসেছে। 'বেহুলার বারমাস্যা' গ্রন্থের অন্তর্গত কাহিনীগুলোও জীবন থেকে উঠে আসা কিছু মুহূর্ত, কিছু ঘটনা। কল্পনার জগতে বিচরণ করে লেখার আগ্রহ তার খুব কম। সমকাল তার গল্পে অত্যন্ত প্রবলভাবে উঠে এসেছে। লেখিকার আশপাশ, মানুষজন, প্রবহমান জীবন সব কিছুই তাঁর মনকে দোলা দেয়। আর সেই অভিজ্ঞতার দলিল হল এই গল্পগুলি। এই গ্রন্থে মোট দশটি গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেগুলি হল—

১. 'জগন্নাথের রথ'

২. 'বেহুলা'

৩. 'ময়না সতী অথবা একটি অলৌকিক কাহিনী'

৪. 'ভাত'

৫. 'এইচ.এফ. ৩৭ রিপোর্টার্জ'

৬. 'গঙ্গার স্বর্গ'

৭. 'জাহ্নবীর মুক্তি'

৮. 'জরৎকুমারী'

৯. 'শিব ঠাকুরের বিয়ে'

১০. 'হাপ্-মাস'

এই 'বেহুলার বারমাস্যা' গ্রন্থে দক্ষিণবঙ্গের বাদা অঞ্চলের দরিদ্র মানুষদের জীবন-সংগ্রাম ও কষ্টকে জয় করার প্রচেষ্টার কাহিনি-অত্যন্ত জীবন্ত রূপে চিত্রিত হয়েছে, যা মহাশ্বেতা দেবীর হাতেই একমাত্র সম্ভব।

মহাশ্বেতা দেবীর 'বেহুলা' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'প্রমা' পত্রিকায় ১৯৭৮ সালে। পরে বিভিন্ন সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। লেখিকার স্বভাবসিদ্ধ প্রতিবাদী মনোভাব, যুক্তিবাদী মানসিকতা ও পুরাকল্পকে প্রত্নপ্রতিমা হিসেবে ব্যবহার করার প্রচেষ্টায় রচিত এই গল্প আধুনিক মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসা ও সমাজ সমস্যার ভাষারূপ হয়ে উঠেছে। গল্পের পটভূমি চব্বিশ পরগণার ইরফানপুর ব্লকের বেহুলা নামক একটি গণ্ডগ্রাম। বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে আড়াই ঘন্টা ট্রেনে গেলে ইরফানপুর স্টেশন। পরে ধানক্ষেতের আলের জল-কাদার পথে হেঁটে এই গ্রাম। গ্রামের নাম বেহুলা, গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীটির নামও বেহুলা। গ্রামটি কালাজ সাপের আবাদে খুবই উর্বরা। সেই সঙ্গে সমগ্র অঞ্চলটিতে শীর্ণ ও বুভুক্ষ মানুষের ফলনও প্রচুর। এই দুই উর্বরতা বৃষ্টি বন্যা-খরা সত্ত্বেও অক্ষুণ্ণ থাকে। এই অপুষ্টিজনিত ক্ষয়প্রাপ্ত, প্রতিরোধহীন মানব শরীরে কালাজ বা সাধারণ করাইত সাপের বিষক্রিয়ার রিসার্চের বিষয় নিয়ে এই অঞ্চলে আসেন কলকাতা শহরের ছেলে বসন্তকুমার। এই বসন্তকুমার বেহুলা গ্রামে এসে জোতদার হৃদয় বা হেদো নস্করের বাড়ি ভাড়া নেন। এই হেদো নস্করের বাড়িতেই কালাজ বা শিয়ড়চাঁদা সাপের চাষ। ইটের পাঁজা করার জন্য সে লক্ষাধিক ইট পোড়ান। দামে না পোষাতে সেগুলি থেকে যায়। যার ফলে কালাজ চাষের উপযুক্ত জায়গা হয় এই ইঁটের পাঁজা। সাপের কামড়ে মৃত্যু হয় গ্রামের বহু লোকের। গ্রামের মানুষদের একমাত্র ভরসা শ্রীপদ মাল। এই শ্রীপদ হল এ অঞ্চলের সাপের ওঝা, উইচ ডক্টর এবং ছেলেদের ভোলাবার কাঠের ঝুমঝুমি বানানোর তার শখ। হেদো নস্কর নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য ভুলে যায়

গ্রামের মানুষের সর্পদংশনে মৃত্যুর কথা। ইরফানপুর হেল্‌থ সেন্টারে সাপের বিষ প্রতিরোধক কোন ইঞ্জেকশন নেই। বরং সাল্‌ফাডায়াজিন, এন্টারোকুইনল ও কাশির মিক্‌সচার পাওয়া যায়। ডাক্তার স্নেক আন্টিসিরাম চেয়ে পাঠালে আরো বেশি করে গর্ভনিরোধক বড়ি ও সালফাডায়াজিন পান। গ্রামের কাউকে সাপে কামড়ালে শ্রীপদ বাঁধন দিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করে হেল্‌থ সেন্টারে নিয়ে যায়। সেখানে মারা গেলে মৃতদেহ গ্রামের নদী বেহুলার জলে ভাসিয়ে দেয়।

লেখিকার ভাষায় সাধারণ মানুষের সংস্কার উঠে এসেছে। বেহুলা নদীকে অভিশপ্ত মনে করে অঞ্চলের লোকজন। সর্প দংশিত লাশ বইতে হয় এই নদীকে। মজে যাওয়া নদী যেন অতি কষ্টে লাশ বয়ে নিয়ে চলে। মনসা পূজার সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। মনসা এখানে বাস্তুরূপে ঘট ও মনসাসিজের ডালে পূজিতা। পূজোর দিন নানা রকমের রান্না হয়, পরদিন অরন্ধন। অনেকের কাছে এটি 'রান্না পূজা' নামে পরিচিত। এখানে মনসামঙ্গল কাব্যের নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

গল্পে বসন্ত কুমারকে ঘিরেও হেদো নস্করের মনে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। বসন্ত রায় ঘটনাসূত্রে জানতে পারে কীভাবে কালাজ সাপের দংশনে বেহুলা গ্রামের মানুষের মৃত্যু হয়। শ্রীপদ মাল আপ্রাণ চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারে না। ইঁটের পাঁজার কথা বসন্ত কুমার হেদো নস্করকে বললেও সে কোন কর্ণপাত করে না। তাই বসন্ত কুমার নিজে এর প্রতিরোধের কাজে নেমে পড়েন। তিনি দরিদ্র লোকদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান, ইঞ্জেকশনের কথা বলেন। সাপের ওঝা শ্রীপদকে ইঞ্জেকশন দিতে শেখান। এমনকি হেল্‌থ সেন্টারের ডাক্তারকে বিষ প্রতিরোধের ঔষুধ আনতে বলেন। নিজে কলকাতা থেকে ঔষুধ আনেন গ্রামের মানুষদের বাঁচানোর জন্যে। শ্রীপদর সঙ্গে গিয়ে চরণ বেরায় যুবতী ও সধবা এবং গর্ভবতী মেয়ে মালতীকে বাঁচিয়ে তুলেন। হেদো নস্কর ছোটলোক শ্রীপদর সঙ্গে বসন্ত কুমারের মেলামেশা ভালো চোখে দেখেননি। আবার বসন্ত রায় একরকম কাজের কথা বলে অন্য কোন কাজে নিযুক্ত আছেন নাকি বলে সন্দেহ করেন। কিন্তু হাকিমের শালা বলে মুখে কিছু বলতে না পারলেও শ্রীপদর বাড়িতে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে গেলে বসন্তের সেখানে যাওয়া ঠিক হয়নি বলে উল্লেখ করেন। গল্পের মধ্যে পাওয়া যায় বসন্ত শ্রীপদর সঙ্গে চরণ বেরার বাড়িতে মনসামঙ্গল শুনতে যায়। মনসার গান বলতে গল্পে বেহুলার উপাখ্যানকে পাই আমরা। মনসামঙ্গলের গল্পটির আঞ্চলিক রূপ দিয়েছেন সাধারণ মানুষ এখানে। এই অঞ্চলের মানুষের গানে বেহুলা-লখিন্দর সংসার করতে থাকে, শেষে লখিন্দর স্বর্গে গেলেও অভিশাপের কারণে বেহুলা মর্ত্যভূমিতে থাকতে

বাধ্য হয়। দেবসভায় যে লাস্য দেখিয়েছিলেন বেহুলা, দেবতাদের মতে এর ফলে পাপ হয় বেহুলার। তাই এই পাপ খণ্ডাতে কলিকালে বেহুলাকে নদী হয়ে বয়ে যেতে হবে। সর্পদংশনে মৃতদেহ বেহুলার জলে ভেসে গেলে তার মুক্তি হবে। তবে কবে মুক্তি পাবে, এর কোন উত্তর দেবতারা দেননি। সেই সময় থেকেই বেহুলা নদী হয়ে বইছে। এখানে গানের শেষে মনসার বন্দনা হয় এবং উঠোনে ধ্বজা পোঁতা হয়। দেখা যায় এই অঞ্চলের মানুষ পুরাণের মনসামঙ্গলের কাহিনীকে নিজেদের জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে নিজের মতো করে গড়ে তোলেন। মনসামঙ্গলের বেহুলা যেমন নিজের জীবন উৎসর্গ করে স্বামী ও ছয় ভাসুরকে ফিরিয়ে আনেন। এই বেহুলা নদীও বিষে জর্জরিত মানুষের দেহ বয়ে নিয়ে চলে। নদীতে জল না থাকলে অতি কষ্টে বয়ে নিয়ে যায় এই মৃতদেহ। গল্পের মধ্যে মনসাদেবীর প্রসঙ্গ দুই রকম দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা যায়। একদিকে মনসাকে শুভাকাঙ্খী রূপে দেখানো হয়েছে। সর্পের দেবী হলেও মানুষ বাঁচলে তিনি অসন্তুষ্ট হন না। এমনকি সাপের ওঝা শ্রীপদও হেদো নস্করের বালক মাহিন্দার শশীকে সাপে কাপড়ালে তাকে বাঁচাতে ইঞ্জেকশন দেয় মা মনসাকে স্মরণ করে—

> ‘‘মা মনসা দয়া করে বিষের পেরি ধরি।
> ভুজঙ্গ জননী ভুজঙ্গের বিষ নিলেন হরি।।
> বিষ গেলেন সপ্ত স্বর্গের উপর দিকে।
> মা মনসা দোহাই দিলেন শঙ্কর পিতার।।
> বিষ গিয়ে শঙ্করের হল কণ্ঠহার।
> জয় জয় শুভঙ্কর শঙ্করের দোহাই।।’’[৪]

এই গান আসলে ইরফানপুর এবং তার সংলগ্ন মানুষের দ্বারা সৃষ্টি। গানের মধ্য দিয়ে মনসার স্তুতি করে মানুষ। যার ফলে মনসা তার হিংস্রতা ছেড়ে দিয়ে কল্যাণময়ী রূপ নেয়।

অন্যদিকে শ্রীপদরা সংকল্প করেন সামনের অগ্রহায়ণে ধান কেটে সবাই চাঁদা তুলে কেরোসিন কিনে হেদো নস্করের ইঁটের পাজায় আগুন লাগিয়ে সাপের বংশ নিঃশেষ করার। এই সাপের আড়ত, যা গ্রামের মানুষের প্রাণনাশ করে, তাকে মনসাপুরীর সঙ্গে তুলনা করেছেন গ্রামের মানুষজন। এখানে মনসাদেবীকে অশুভ শক্তির প্রতীক রূপে দেখানো হয়েছে।

গল্পের শেষের দিকে দেখতে পাই গবেষক বসন্তকুমার সাপের বংশ নাশ করার জন্য ভগ্নীপতির কাছে সাহায্য চেয়েও পাননি। আধিকারিকরা গ্রামের প্রধানকে অসন্তুষ্ট করতে চান না।

অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত, শক্তিশালী, পুঁজিবাদী ব্যক্তিরা দরিদ্র মানুষদের বোকা বানিয়ে, শোষণ করে, ভয় দেখিয়ে শান্তি বজায় রাখে। তাতে আধিকারিকরা সমর্থনই করেন। উচ্চ শ্রেণির মানুষেরা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে দরিদ্র মানুষের জীবনও তাদের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ে। একসময় ওঝা শ্রীপদ মালকেও সাপে কামড়ায়। মনসার পূজারী এই শ্রীপদকে বাঁচাতে পারে না বসন্ত শত চেষ্টা করেও। বেহুলা গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে। ফলস্বরূপ বসন্ত কুমারের নেতৃত্বে গ্রামের মানুষ ইঁটের পাঁজায় আগুন লাগিয়ে দেয় সাপের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। এই আগুন লাগানোর মাধ্যমে অত্যাচারিত শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে অন্তেবাসী মাল জনগোষ্ঠী। গল্পের শেষ কয়েকটি লাইনে দৃশ্যটি আরো সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে—

> ''আগুনের তাপে ছিটকে পড়ে কালাজ। সবাই চেঁচিয়ে ওঠে, নতুন উদ্দীপনা পায়। খড়ের পাঁচিলে কাঠ পড়ে, কেরোসিনের পিচকিরি। সাপ বেরোতে থাকে। মরতে থাকে। গ্রামের লোকগুলির শোক, কালাজ বিষয়ে ভয়, হেদো নস্করের ওপর রাগ, সব উত্তরিত হয় এক্ষণিক প্রজ্জ্বলন্ত ক্রোধে। আগুন তাই ভীষণ জ্বলে।''[৫]

এইভাবে অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ দরিদ্র মানুষের মধ্যে প্রতিবাদের আগুন জ্বলে ওঠে। বিশ শতকের এই মানুষরা আজকের বেহুলাকে আর কষ্ট পেতে দেয় না। মুক্তি পায় বেহুলা নদী, তাকে আর বইতে হয় না সাপের কামড়ের মৃতদেহ। সমালোচক প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তাই যথার্থই বলেছেন—

> ''বসন্তর আপ্রাণ চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে শ্রীপদ মৃত্যুবরণ করলে সমস্ত গ্রাম স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তার দেহ বেহুলা নদীর ঘূর্ণীর কাছে এসে পাক খেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলে সমস্ত গ্রাম পুনরায় মধ্যযুগীয় অন্ধকারে ক্রমশ নিমজ্জিত হতে থাকে। কিন্তু লেখিকা শ্রীপদের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে কাহিনির গতিপথকে রুদ্ধ করেন না। বরং প্রতিরোধের আগুন জ্বালিয়ে প্রাচীন গ্রামকে বর্তমান কালের সমস্যাদীর্ণ অধ্যায়ের মুখোমুখি দাঁড় করান। শ্রীপদর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে নাটকীয়ভাবে কাহিনিকে প্রতিবাদের কেন্দ্রে স্থাপন করেন।''[৬]

কথাকার মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ একটি অঞ্চলের মানুষের সমস্যা তথা অর্থনৈতিক শোষণ

ও সামাজিক নির্যাতন এবং বর্ণবৈষম্যে ও সমস্ত প্রকারের শোষণের শিকার এই মানুষদের জীবন চিত্র তুলে ধরেছেন অত্যন্ত নিখুতভাবে। তবে গল্পটিতে আধুনিক সময়ের বিশেষ একটি অঞ্চলের মানুষের জীবনসমস্যা তুলে ধরলেও লেখিকা নিপূণ কৌশলে মনসামঙ্গলের পুরানো গল্প ও অনুষঙ্গকে ব্যবহার করেছেন সচেতনভাবে। অঞ্চলের মানুষের লোকজবিশ্বাস, লোকরীতির সঙ্গে কোলকাতা শহরের সংস্পর্শে আসার ফলে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবুদ্ধি এসেছে গল্পে। তাই শ্রীপদর মতো সাপের ওঝাও সাপের কামড়ে জর্জরিত মানুষের চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে জানে। বিভিন্ন রকম সাপের কামড়ের বিভিন্ন লক্ষ্মণ, বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে নিখুঁতভাবে জানে, যা গবেষক বসন্ত কুমারকে আশ্চর্যিত করে তোলে। আবার সেই শ্রীপদর মুখে শোনা যায়, এই বেহুলা ও তার সংলগ্ন অঞ্চলেই চম্পকনগর ছিল। চাঁদ সদাগরের কাহিনী যেন তাদের আত্মার সঙ্গে জড়িত। অন্যদিক দিয়ে গল্পটি হয়ে উঠেছে অসহায় মানুষের প্রতিবাদের গল্প। বছরের পর বছর সাপের কামড় খেতে খেতে শেষে হেদো নস্করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। তাই বলা যায় মনসাপুরাণের মিথকে সাধারণত মানুষের লোকবিশ্বাসের সঙ্গে মিশিয়ে, সেই সঙ্গে প্রতিবাদের ভাষা যুক্ত করে এক নতুন গল্পের সৃষ্টি করেন। সেই দিক দিয়ে গল্পটি হয়ে উঠেছে মনসামঙ্গল কাব্যের আধুনিক নির্মাণ।

বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম কারিগর হলেন শ্রদ্ধেয় **বিমল কর** (১৯২১-২০০৩)। যুগান্তকারী উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনায় পারদর্শী এই লেখক মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম চরিত্র বেহুলার অনুষঙ্গ নিয়ে রচনা করেন '**বেহুলা**' নামক ছোটগল্পটি। কবিতাটি আলোচনা করার পূর্বে কবি সম্পর্কে দু'চার কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করছি। লেখকের বাল্য ও কৈশোরকাল কেটেছিল বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে। এই সমস্ত অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রাকে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছেন। এবং তার অভিজ্ঞতাগুলি লিখিত রচনার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। 'উত্তরসূরী' পত্রিকায় (১৯৫২) তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা 'ইঁদুর' গল্পটি প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯৫৪ সাল থেকে দেশ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন এবং তার অধিকাংশ রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তার অন্যতম রচনাগুলির মধ্যে 'দেয়াল' (৩খণ্ড যথাক্রমে ১৯৫৬, ১৯৫৮,১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে), 'অসময়' (১৯৭২), 'যদুবংশ' (১৯৬৮), 'খড়কুটো' (১৯৬৪) ও 'বালিকা বধূ' উপন্যাস এবং 'আঙুরলতা', 'আত্মজা', 'গ্যাস বার্ণার', 'হ্রদ', 'মানবপুত্র', 'যযাতি', 'সুধাময়', 'নিষাদ' প্রভৃতি ছোটগল্পগুলি উল্লেখযোগ্য। বাংলা কথাসাহিত্যে পঞ্চাশের দশক থেকে প্রবলভাবে ছায়া বিস্তার করে তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাস।

তবে সত্তরের দশকে তাঁর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে গল্পভারহীন এক নতুন ধরনের কাহিনী রচনার আন্দোলন। তাঁর রচনায় সমকাল প্রবলভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে।

বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম পূজারী বিমল করের 'বেহুলা' গল্পটি ১৩৩২ বঙ্গাব্দে শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। কবিতাটি কোন সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। লেখক এই গল্পটিতে অত্যন্ত সাধারণভাবে বৃদ্ধ ঠাকুরদা ও তাঁর স্ত্রী ইন্দুমতীর কথা তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে রয়েছে তাদের কয়েকদিনের কাজের মেয়ে বেহুলা। 'বেহুলা'তে গল্পের কথক কলকাতার অবসরপ্রাপ্ত এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। শ্বাসকষ্টের অসুখের জন্য ডাক্তার হাওয়া বদল করতে বললে বাড়িতে পূজো কাটানোর পর লক্ষ্মীপূজোর আগে আগে কলকাতার বাইরে একটি নির্জন শান্ত পাহাড়ি এলাকায় আসেন। সেখানে তাদের দেখাশোনার ভার এসে পড়ে বেহুলা নামক একটি মেয়ের হাতে। গল্পটির শুরুতেই দেখা যায় বেহুলা ঠাকুরদার সাথে গল্প করতে ব্যস্ত। এখানে মনসামঙ্গলকাব্যের প্রভাব সেরকম ভাবে না থাকলেও বেহুলার মিথ ছায়া ফেলেছে। গল্পের কথক ও তাঁর স্ত্রী ইন্দুমতীর কাজকর্ম করার জন্য পাশের জজ বাড়ি থেকে বেহুলাকে পাঠায়। এই বেহুলা বাবা-মাকে কোনদিন দেখেনি, ঝাড়গ্রামে বোষ্টম দিদির সঙ্গে ভিক্ষে করত। এই বোষ্টম দিদি রেলে কাটা পড়লে বেলবাবুর বাসায় কাজ করেন কিছু দিন। রেলের কুলি কাবারি, পানঅলারা ওকে নিয়ে ঠাট্টাতামাশা করলে জজগিন্নি নিজের কাছে নিয়ে এসে কাজকর্ম শিখিয়েছেন। তিন-চার বছর হল বেহুলা এখানে রয়েছে। ঠাকুরদা বেহুলার নামের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন বেহুলার মতো সেবাপরায়ণতা। তাঁর ছেলেমেয়েরা যতটুকু না দেখাশুনা, আদর-যত্ন করতে পেয়েছে, ছোট এই মেয়েটি যেন তার চেয়ে ঢের বেশি। তাকে পুরাণের চাঁদ সদাগরের পুত্রবধূ বেহুলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, সে নিরক্ষর হলেও বেহুলার গল্প সম্পর্কে অবগত। বেহুলা যে অতিসাহসী ও সহনশীলা নারী সেটিও তার জানা। তাই সে উত্তরে অনায়াসেই বলে—

> ''মড়া নিয়ে স্বগ্গে গিয়েছিল, না গো ঠাকুরদা।
> মড়া নিয়ে কেমন করে যায় ঠাকুরদা? ভয়
> করে না? ঘেন্নাপিত্তি নাই?''[১]

তবে ঠাকুরদার মতে, তখন প্রাচীন যুগে গিয়েছিল এখন আর কেউ যায় না। এইভাবে বর্তমান যুগের প্রেক্ষিত আলোচনা করতে গিয়ে বেহুলা চরিত্রের অনুষঙ্গ নিয়ে এসেছেন।

গল্পের বৃদ্ধ কথকের দুই পুত্র রাজু ও অজু এবং এক কন্যা। কলকাতায় থাকাকালীন ঠাকুরদার

ক্রনিক ব্রংকাইটিস হয়, বর্ষাকালে একমাস ধরে শয্যাশায়ী থাকেন। সেই সময় ছোট ছেলে অজু মাত্র দুই হাজার টাকা পাঠিয়ে এবং কয়েকটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে মা-বাবার প্রতি কর্তব্যবোধ সেরেছে। মেয়ে-জামাইও ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে অসুস্থ বাবাকে দেখতে আসার সময় পায়নি অথচ তারা ছেলেমেয়েদের নিয়ে জামাই-এর কর্তার বাড়ি 'নেমন্তন্ন' রক্ষা করতে যায়। বড় ছেলে রাজুও মা বাবাকে কম অবহেলার চোখে দেখে না। অসুস্থ বাবাকে ডাক্তার শীতকালে হাওয়া বদলের উপদেশ দেয়। কিন্তু বড় ছেলে রাজু ও তার স্ত্রী জোর করে বাবা-মাকে লক্ষ্মীপূজার আগে আগেই পাঠিয়ে দেয় বায়ু পরিবর্তনের জন্য এক নির্জন পাহাড়ি জায়গায়। এর পেছনে এক বড় স্বার্থ চরিতার্থ করেছে সে। ইন্দুমতী বউমার বাপের বাড়ির পাড়ার এক বন্ধুর কাছ থেকে জানতে পারেন বউমার দাদা-বউদি বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে দিল্লী থেকে এসে কলিকাতায় তাদের বাড়ি মাস-খানেক থাকবে। তাই ডিসেম্বর মাসে চুনারে যাওয়ার কথা থাকলেও ছেলে-বউমা তড়িঘড়ি করে তার আগেই পাঠিয়ে দেয়। লেখক তৎকালীন সময়ে মধ্যবিত্ত সমাজের ভাঙাগড়া, অর্থনৈতিক টানাপোড়েন এবং মূল্যবোধহীনতার চিত্র তুলে ধরেছেন। যেখানে সহানুভূতি নেই, সহমর্মিতা নেই, বাবা-মায়ের প্রতি কোন দায়বদ্ধতা ও আন্তরিকতা নেই। আবার বিশ্বায়নের প্রভাবে মানুষের অভ্যস্ত জীবনের বদল। তাই ছোটনাগপুরে মোটর স্পোর্টস-এ কাজ করলেও অসুস্থ বাবাকে দেখতে আসতে পারেনি। দুঃখে তাদের পিতা অনায়াসেই বলে উঠতে পারে স্ত্রীকে—

> ''সংসারে দাবি নিয়ে ঝগড়া করতে নেই; যতক্ষণ তুমি সক্ষম, তোমার হাতে দড়িরথের— ততক্ষণ তোমার দাবি টেঁকে— তারপর আর থাকে না। এ-সব মেনে নাও।''[২]

তবে স্ত্রী ইন্দুমতি এই অন্যায় কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। সংসারে ধরে রাখার অধিকার মানুষকে একদিন হারাতে হয়, সবকিছু ফেলে যাওয়ার দিন এখন— তা মেনে নিতে নারাজ সে। বাবা-মা তাদের সর্বস্ব ত্যাগ করে সন্তানদের প্রতিপালন করে। কিন্তু নিজের সন্তানরাই পরিণত হয় স্বার্থপরে। মধ্যবিত্ত মানসিকতা ও সংকীর্ণ স্বার্থপরতার জন্য এই সন্তানরা বাবা-মাকে দুঃখ-যন্ত্রণা, অবহেলা, আঘাত ছাড়া কিছুই দিতে পারে না। 'বেহুলা' গল্পে ঠিক একই চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। আসলে বিশ শতকের ভালোবাসাহীন, সহানুভূতিহীন ও আন্তরিকতাহীন পৃথিবীতে পুরোপুরি একা ও অসহায় বৃদ্ধ বাবা-মায়ের অন্তরের হাহাকার ফুটে উঠেছে।

বর্তমানের জটিল এই পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে গিয়ে লেখক প্রাচীন ঐতিহ্যের দিকে

মুখ ফিরিয়েছেন। মনসামঙ্গলের বেহুলা যেমন বাসররাতে বিধবা হয়েও সমস্ত চাওয়া-পাওয়া ত্যাগ করে স্বামীকে জীবিত করার জন্য গাঙ্গুড়ের জলে ভেসে যায়। তার সেবাপরায়ণতা, পাতিব্রাত্যতা, একনিষ্ঠতায় মুগ্ধ হয় দেবকূল। তিনটি পরিচ্ছেদে রচিত রচিত গল্পটির শেষ পরিচ্ছেদে দেখি হঠাৎ করে বেহুলাকে বিষাক্ত এক বিছে কামড়েছে। এখানে দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সেবা যত্নে সে আবার সুস্থ হয়ে ওঠে। এমনকি মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই ছোট মেয়ে বেহুলা হয়ে উঠেছে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার একমাত্র ভরসা। তাই মনসামঙ্গলের বেহুলার মতো মৃতদেহ নিয়ে ভেসে যেতে না পারলেও বৃদ্ধ ঠাকুরদা ও তার স্ত্রী ইন্দুমতীকে মানসিক আশ্রয় দান করে। তাদের বেদনার ভাগিদারী হতে চায় সে। তাই বেহুলার মেরামত করা চেয়ারে অনায়াসেই বসতে পারে ঠাকুরদা। তার মতে— ''এখনও বসার মতন জায়গা আমার রয়েছে।''[৩] তাই বলা যায় আধুনিক সংকটময় যুগে আজও মানুষকে হাত বাড়াতে হয় প্রাচীন ঐতিহ্যের দিকে। মনসামঙ্গলের বেহুলার আদলে তৈরি এই গল্পের বেহুলা। চাঁদ সদাগর যেমন সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে বেহুলাকে কেন্দ্র করে নতুন দিনের আলো দেখিয়েছেন। এখানেও বৃদ্ধ ঠাকুরদা ও স্ত্রী ইন্দুমতীর আশার আলো হল এই বেহুলা। এই দিক দিয়ে গল্পটি হল মনসামঙ্গল কাব্যের নবনির্মাণ।

আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে মনসা কথার নবনির্মাণের ক্ষেত্রে আমরা আরেকটি ছোটগল্পের সন্ধান পাই, সেটি হল বাংলা সাহিত্যের অন্যতম যুগান্তকারী কথাকার সাধন চট্টোপাধ্যায়ের (১৮ই জানুয়ারি ১৯৪৪) 'সতত বেহুলা' ছোটগল্পটি। বিশ শতকের ৭০-এর দশকের এক ভিন্নধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আবির্ভাব প্রসিদ্ধ লেখক সাধন চট্টোপাধ্যায়ের। তাঁর লিখিত পাঁচশোর বেশি ছোটগল্প এবং দুইশটির বেশি প্রবন্ধ রচনা করেন। এছাড়া রয়েছে তাঁর কতকগুলি অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। তৎকালীন সমাজের মানুষের আত্মসংকট, মূল্যবোধহীনতা এবং সামাজিক অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উপন্যাস ছোটগল্পে দেশভাগজনিত পরিস্থিতি, নকশালবাড়িকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদী আন্দোলন সবই উঠে এসেছে। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে পাই— 'জল তিমির', 'মাটির অ্যান্টিনা' , 'ধরিত্রী', 'সাতপুরুষের ডটকম', 'বিন্দু থেকে বৃত্তে' প্রভৃতি এবং 'শ্রেষ্ঠ গল্প', 'গল্প সংগ্রহ' ১, ২, ৩ এবং 'পঞ্চাশটি গল্প' প্রভৃতি গল্পের বই আমরা পেয়ে থাকি। তাঁর অন্যতম গল্পগুলি হল— 'মেহগণি', 'ছাব্বিশ ফুট', 'স্টিলের চঞ্চু', 'অদিতির জন্য চারটি মিডি বাস' প্রভৃতি।

গল্পকার সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'সতত বেহুলা' ছোটগল্পটি 'পরিকথা' (ডিসেম্বর ২০০৫)

পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় এবং পরে 'গল্প ৫০' গ্রন্থে সংকলিত (১৮জানুয়ারী ২০০৯) হয়। একুশ শতকের সূচনাপর্বে রচিত এই গল্পটি আকারে ছোট হলেও এর মধ্যে রয়েছে গভীর ব্যঞ্জনা। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের আত্মসংকট ও মনোবিশ্লেষণের দিকটি তুলে ধরতে গিয়ে মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন।

পোস্ট অফিসে চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর পনেরোটি বছর কেটে গেছে শান্তিনাথের। স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি-নাতনি নিয়ে ভরাট সংসার থাকলেও তিনি যেন একা। পঁচাত্তর বছরের শান্তিনাথ টাকা-পয়সা হিসেবের সঙ্গে নিজের ব্যক্তি-স্বাধীনতা নিয়েও অত্যন্ত চিন্তিত। তিনি সারাদিন ও সারারাত নিজের মতো করে সাজিয়ে, নিজের মধ্যেই বিলীন থাকেন। দিনের বেলায় তিনি পিঁপড়ের মতো ব্যস্ত থাকেন। চাঁদা, কমিটি, পেনশন হোল্ডারদের সংঘ, এলাকার উপদেষ্টা, উন্নয়ন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন দিনের বেলায়। রাত্রি বেলায় তিনি নিজের কুঠুরিতে অনেকক্ষণ জেগে থাকেন। দরজা জানলা সেঁটে মাঝরাত অবধি নিঃশব্দ একটি টিভি চালিয়ে রাখেন। তাঁর একক ও বিচ্ছিন্ন জগতে চেতনার গভীরে জ্বলে ওঠা বাসনাগুলি সরাতে পারেন না বলেই স্ত্রী-পুত্রবধূকে লুকিয়ে নিজেকে নিজের কাছে উৎসর্গ করার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

পঁচাত্তর বছরের শান্তিনাথ একঘেয়ে জীবনের মধ্যে বাঁচার জন্য নিজেই বিভিন্ন পন্থা খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করেন। কখনো পুরনো সহকর্মী পরিমল বাড়িতে এলে বিকেলের আড্ডা জমে ওঠবে বলে খুশি হয়। সমবায় গড়া নিয়ে জগদীশ পাল্টা যে গোষ্ঠীবাজি শুরু করছে, পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর পাওয়া যায়। বিরাজ কান্তির খবর, সর্বানীর খবর, পাওয়া যায়। বিরাজকান্তির খবর সর্বাণীর খবর, কয়েকজনের ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার কথা, কয়েকজনের মৃত্যুর খবর সবই দিবে সে। আবার কখনো পাড়ার ছেলে পবিত্র এসে দু'টো কথা বলবে বলে পথ চেয়ে থাকেন তিনি। খেয়ালবশে আবার পুরনো মহিলা সহকর্মীকে ফোন করেন দুপুরবেলা।

পরিস্থিতি বদলে যায়, তবুও মানুষ যুগের এই পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারে না। শান্তিনাথও রাস্তার যানবাহনের যে আইনী চলা, রাস্তার ধারের সাইনবোর্ডের ৫৩টির মধ্যে ৪১টিই ইংরেজিতে লেখা। এই সমস্ত অনিয়ম বিশৃঙ্খলাতা দেখলে তাঁর মনে বিদ্রোহী মনোভাব জেগে ওঠে। নিজের মধ্যে পুরনো শান্তিনাথকে খুঁজে বের করতে চাইলে এখন আর সম্ভব হয় না। শরীরের কোথাও ব্যথার মেঘ থমকাতে থাকে। বয়সের ভার তাঁকে যে চারপাশ থেকে একটু বিচ্ছিন্ন করতে চায়, এবং রোজই সে সবের আয়োজন যে বাড়ছে আজকাল বুঝতে বেশি-মাথাব্যয় করতে হয় না

শান্তিনাথের। তবুও তিনি নিজের সঙ্গে লড়াই করতে থাকেন। লেখকের ভাষায় উঠে এসেছে—

> ''পরিবারের আড়ালে, ছোটস্পেসে, বিছানায় একাকী তিনি নিজের কাছে একান্ত আপন। 'নিজ' এবং তিনি তো একাকার নন। যখন স্বাধীনতায় ভাবেন, একাকার হয়েছেন, কেবলমাত্র রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর থেকে, বাড়িটা যখন গভীর ঘুমে, স্বাধীনতায় উদ্ভুত স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে থাকেন।''[৭]

গল্পটি আরো তাৎপর্য হয়ে ওঠে যখন শান্তিনাথ তাঁর পোস্ট অফিসের সহকর্মী অর্ধেন্দু দত্ত রায়ের সঙ্গে হঠাৎ রাস্তায় দেখা হলে, তাকে কুশল জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেন— ''জী-ব-ন থেমে থা-কে-না।'' অর্থাৎ মানুষ যেন শুধু অসংখ্য জীবনে পরিণত হয়েছে। শান্তিনাথের স্বাধীনচেতা ভাবুক মন কিছুতেই তা মেনে নিতে পারেন না। আবার শীতের মফঃস্বল-সন্ধ্যা একেবারে চিত্রহীন হয়ে পড়ে, তাদের রক্তচাপ বাড়তে থাকে নীরবে। আবার পরিবারে ঘরের অভাব বা ভাগের টি.ভি. হলে বৃদ্ধরা আরো অসহায় হয়ে পড়েন। বসবাসের সংস্থানটুকুও তাদের হারাতে হয়। আর এই অবস্থায় প্রতিটি জনের ব্যবহার শান্তিনাথের মনে সংকট তৈরি করে, সংঘর্ষ বাঁধায়। তবুও শান্তিনাথ আশা হারায়নি, মনসামঙ্গলের বেহুলা যেমন কলার ভেলায় ভেসে অমরার দেশে যান। সেখানে লাস্যনৃত্যের মাধ্যমে প্রার্থনা করেন মৃত স্বামীর জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। উক্ত স্থানে সমালোচক প্রভাতকুমার ভট্টাচার্যের কথাটি তুলে ধরা হল—

> ''আসলে শান্তিনাথের জীবনে রাত্রির জগতে পৌঁছানোর আকাঙ্ক্ষাই যেন 'অমরা'। সতত বেহুলার মতো বাসনাগুলিকে বয়ে নিয়ে তিনি চলেছেন সেই অমরার দিকে। একসময় 'একান্ত স্বাধীনতা' নামক দেবতার কাছে উপনীত হয়ে বাসনায় নৃত্যলাস্য শুরু করতে চান।''[৮]

একুশ শতকে দাঁড়িয়ে লেখক এক অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ ভদ্রলোকের জীবনের নানা সমস্যা তুলে ধরেছেন। কিন্তু সেটি আর ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি এবং বিশেষ সময়ে মধ্যে থেমে থাকে নি। ব্যক্তি ও দেশকালের উর্দ্ধে সার্বজনীন সমস্যা হয়ে উঠেছে। আর এই সমস্যা থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন মনসা-কথার বেহুলাকে। সাহসিনী, একনিষ্ঠ, কল্যাণময়ী, প্রতিব্রতা, প্রতিবাদী বেহুলাই যেন একমাত্র ভরসা। তাই বলা যায় লোকপুরাণকে নিয়ে বর্তমানের সমস্যাকে চিত্রিত করে এক নতুন শিল্পের নির্মাণ করেছেন।

পরিশেষে বলা যায় উপরিউক্ত ছোটগল্পগুলিতে মনসা-পুরাণের কথার বিভিন্ন লোকবিশ্বাসগুলি অতি সন্তপর্ণে উঠে এসেছে। প্রধানত মনসামঙ্গলের অন্যতম নারী চরিত্র বেহুলার প্রসঙ্গ নিয়ে আসা হয়েছে ছোটগল্পগুলিতে। মধ্যযুগে দাঁড়িয়ে বেহুলা যেমন চাঁদ সদাগরের হৃত সর্বস্ব ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। তার কাছে নিজের থেকে বড় হয়ে ওঠে পতিভক্তি । সেই সঙ্গে অন্যায়কে বেহুলা মেনে নেয়নি। তাই সে হার মানিয়েছে অকাল বৈধব্যকে। আধুনিক কালেও লেখকগণ এই বেহুলাকে কল্যাণময়ী নারী রূপে দেখিয়েছেন। কখনো নদীরূপে, কখনো কাজের মেয়ে রূপে, কখনো মানুষের অবচেতনে নারীর ধৈর্যশক্তি রূপে এই বেহুলা রূপে মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মনসামঙ্গলের বেহুলার নবরূপায়ণ ঘটেছে। আর এইভাবে আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে মনসা কথার নবনির্মাণ ঘটেছে।

**তথ্যসূত্র:**


১. বিমল কর, বেহুলা, শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৯২, পৃ. ৮১

২. তদেব, পৃ. ৮৩

৩. তদেব, পৃ. ৮৪

৪. মহাশ্বেতা দেবী : বেহুলার বারমাস্যা', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স পা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৪১৪, পৃ. ৬৭

৫. তদেব, পৃ. ৬৪

৬. প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর', বাকপ্রতিমা, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১২, পৃ. ২৩২

৭. সাধন চট্টোপাধ্যায় : ৫০টি গল্প, প্রকাশভবন, ২০০৯, পৃ.২৩৭

৮. প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর', বাকপ্রতিমা, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১২, পৃ. ২৩৭


*****